ছড়ানো মুক্তা

দ্বীন মানছি শুধু আল্লাহ'র হুকুম হিসেবে নাকি সন্তুষ্টচিত্তে

2020-01-18 22:53:40 +0600 +0600

17 MIN READ

গত রমযানের আগের রমযানে আমার এক ভাগ্নে ইন্তিকাল করেছে। তার আগে ও অসুস্থ ছিল। হসপিটালে, অবস্থা খুব খারাপ, অবনতি হচ্ছে। ঐ সময় ওর অবস্থা যখন খুব খারাপ, ওর বোন স্বপ্নে তার মাকে বলছে, যিনি আগে ইন্তিকাল করেছেন মানে আমার বোন। আর স্বপ্নের মধ্যে ওর বোন বলল যে, অবস্থা খুব খারাপ, অসুস্থ ইত্যাদি। ওর মা একথা শুনে মোটামাটি কোন গুরুত্বই দিল না, স্বপ্নের ভিতরে।

এটাই হওয়ার কথা। দুনিয়াতে যেসব জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন জাহেরী জগতে, গায়েবী জগতে ঐটার কোন গুরুত্বই নাই। আর গায়েবের জগতে যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জাহেরী জগতে কোন গুরুত্বই নাই। দুনিয়ার জগতে কারো বাদশা হওয়া বহুত বড় ব্যাপার, আর ফকির হওয়ার তার একেবারে বিপরীত অবস্থা। আখিরাতে গেলে হয়তো দেখা যাবে তার উল্টো, ফকির হলেই সুবিধা, মানসম্মানও বেশী। আর রাজাবাদশাদেরই মুসীবত। সব উলট-পালট হয়ে যাবে। এখানে যেটা বড়, ওখানে সেটা ছোট। এখানে যেটা ভাল, ওখানে ঐটা মন্দ। তো এই ভাল মন্দের পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে যার কাছে আখিরাত চোখের সামনে, তার সবকিছু দেখাও ঠিক, কারণ মানুষ জাহেরীভাবে দেখে চোখ দিয়ে, কিন্তু আসলে সে তার মন দিয়ে দেখে।

* * *

এক জানাযা যাচ্ছে। জানাযা দু'জন দেখল, একজন এই দুনিয়ার চিন্তার মধ্যে আছে, আর আরেকজন আখিরাতের চিন্তার মধ্যে আছে। দুনিয়ার চিন্তার মধ্যে যে আছে, এই জানাযা দেখে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করবে যে এই লোকটা কে? পিছনে তার পরিচয় কি? সম্পত্তি কি কি রেখে গেল, ছেলেদের কি আছে, ওদের ভাগ বাটোয়ারা কেমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই লাইনেই জিজ্ঞেস করে। পত্রিকায় দেয়ও কি কি রেখে গেছে। পত্রিকায় সাধারণত সন্তানের কথা লিখে; (কিন্তু) কি সম্পত্তি রেখে গেছে এগুলো একটু লজ্জা করে লিখেনা, কিন্তু আনঅফিসিয়ালি ওগুলো আলোচনা করে। জমিজমা, বাড়ি, কি কি রেখে গেছে ইত্যাদি।

ঐ জানাযা দেখেই আখিরাতমুখী যে, তার মনে কোন প্রশ্নই জাগল না যে কি রেখে গেছে। তার মনে প্রশ্ন হল যে কি নিয়ে গেছে। ওখানে থাকবার জন্য সে কি সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। **তো একজন ভাবছে কি সম্পদ রেখে গেল আর আরেকজন ভাবছে কি সম্পদ সামনে নিয়ে গেল**। দেখছে একই জানাযা, কিন্তু দুজনের দেখা একই রকম নয়।

তো আল্লাহওয়ালাদের দেখা আর দুনিয়াদারদের দেখা ভিন্ন। আর দেখা যদি ভিন্ন হয় তাহলে তার পরিপ্রেক্ষিতে সব চিন্তা, পরবর্তী সব পদক্ষেপ ভিন্ন হবে।

* * *

হাদীস শরীফে কয়েকটা ঘটনা আছে যেখানে ছোট শিশু কথা বলেছে। তার মধ্যে একটা হল 'এক মায়ের কোলে তার বাচ্চা'। একজন রাজা বা বাদশা বা ঐ ধরনের কিছু মহা ধুমধামে যাচ্ছে। দেখে মা বলল, 'হে আল্লাহ, আমার ছেলেকে এরকম বানাও'। ঐ শিশু মায়ের দুধ খাচ্ছিল। সে মুখ থেকে দুধ ছেড়ে বলল, "আমাকে এরকম বানাবে না'। তারপর চলল। কিছুক্ষন পরে দেখল একজন মহিলাকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লাঞ্চিত অপদস্থ অবস্থায়, আর মানুষ তাকে গালাগালি দিচ্ছে। দেখে মা বলল যে, 'আল্লাহ, আমার ছেলেকে এরকম বানাবে না'। ছেলে আবার ঐ দুধ ছেড়ে বলল, 'আমাকে এরকমই বানাও'।

ছেলেকে, বাচ্চাকে আল্লাহ তাআলা গায়েবের দৃষ্টি দিয়েছেন। শিশুরাতো এখনো দুনিয়ার পরশ পায়নি, প্রভাবও পরেনি। (তবে) কখনো কখনো দেখতে পারে, কখনো বুঝতে পারে। তো ঐ বাদশাকে দেখে দুনিয়ার দৃষ্টিতে বহুত বড় মনে হয়, অথচ হক্বীকতে তার অবস্থা খুবই খারাপ। একজন ফাসিক ব্যাক্তি, গুনাহগার, জালিম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরেই তো তার আযাবের

জিন্দেগী আরম্ভ হল। বরং আগেই আরম্ভ হয়ে যায়।

* * *

উমাইয়্যাদের মধ্যে একজন বাদশা, খলিফাই বলত, কিন্তু খারাপ হতে বেশী দেরী লাগে না, ভাল একটা জিনিস করতে দেরি লাগে। কিন্তু এটা নষ্ট হতে দেরি লাগে না। কখনো কখনো তরকারিও এমন হয়।

* * *

পরিবারের বেশ কয়েক বছর আগের কথা। নতুন এক বিয়ে হয়েছে আর সেই বিয়ে উপলক্ষে পরিবারের লোকজন সবাই আনন্দ ফুর্তি করবে। কয়েকজন মিলে কোথাও যাচ্ছে, সাথে খাবার নিয়েছে রান্না করে। কয়েকজনে কিছু ভাল খাবার নিয়েছে। এক জায়গায় গিয়ে কোন কারণে গাড়ির পিছনের ট্রাংক খুলেছে, খোলার সাথে সাথে প্রবল দুর্গন্ধ বের হয়েছে। একটা পাতিলের মধ্যে রান্না করা কোন কিছু ছিল। ঐটা পঁচে, ওখান থেকে দূর্গন্ধ বের হয়েছে। অথচ এই রান্না খুব বেশিক্ষন হয়নি। অল্পসময়ের মধ্যে পঁচেছে, শুধু পঁচেছে যে তাই নয়, পঁচে একেবারে দূর্গন্ধে সম্পূর্ণ পরিবেশ ভরিয়ে ফেলেছে। পঁচতে বেশি দেরি লাগে না।

তো উমাইয়্যাদের জমানায় একজন বাদশা ছিলেন। বাদশাদের হাতে ক্ষমতা প্রচুর। বড় বিলাসী ছিল, বদ আখলাক ছিল। গোটা দেশের সুন্দরী মহিলাদেরকে আনত। জাহেরীভাবে একটা শরীয়তের সূরতে রাখত। কিছুদিন রেখে তালাক দিয়ে ছেড়ে দিল, আরেকজন বিয়ে করল। পরবর্তীতে বিয়ের তো কোন বালাই নেই, ওখানে কিছু আইন রক্ষা করত, বলা যেতে পারে যে লাইন ধরে আনছে আর কিছুদিন রেখে রেখে ছাড়ছে। অল্প বয়সেই তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। জানাযা, দাফন ইত্যাদির প্রস্তুতি হচ্ছে। যখন কাফন পড়ানো হয়েছে, ঐ সময় ভিতর থেকে নড়ে উঠল। একটু ঝাকুনি দেখেই (বাদশার) ছেলে ভেবেছে বোধহয় বেঁচে আছে। তার আগ্রহ হয়েছে যে বোধহয় মারা যায়নি। পরিবারে একজন আল্লাহওয়ালা মুরব্বী ছিলেন, সাথে সাথে বললেন, ‘না, তা নয়। তোমার বাপের দিকে আযাব বড় দ্রুত আসছে’। তো এখনো দাফন করেনি, কিন্তু আযাবের ফিরিশতাদের যেন আর ধৈর্য হচ্ছে না। দাফনের আগে থেকেই তার উপর আযাব আরম্ভ হয়ে গেছে। তো উনি পরিবারের আল্লাহওয়ালা মুরব্বী ছিলেন। উনি বললেন ছেলেকে বুঝিয়ে (ছেলে যখন বলল নড়া দেখে যে বোধহয় মারা যায়নি), না না, মারা গেছে ঠিকই, তোমার বাপের দিকে আযাব বড় দ্রুত আসছে। তো দুনিয়ার দৃষ্টি এক ধরনের, আখিরাতের দৃষ্টি আরেক ধরনের। দুনিয়ার দৃষ্টিতে মনে হয় রাজা কত ভাল। আর এই অপদস্থ মহিলা কত খারাপ। আর সেই দৃষ্টিতে মা দোয়া করছে আর বাচ্চা ছেলে সেই দোয়া খন্ডন করছে।

* * *

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীন দিয়েছেন। এক হল আমরা দ্বীনকে জাহেরী জগতের সব নিয়ম কানুন এগুলোর উপর প্রয়োগ করতে চাই। দুনিয়ার মানুষ দুনিয়াকে যেভাবে দেখে, সেইভাবে দেখব আর দ্বীনদারীর উপর চলব। দুনিয়ার মানুষ সম্পদকে খুব ভাল দৃষ্টিতে দেখে, আমিও সম্পদশালী হব। পার্থক্য এটুকু ‘হালালভাবে’। কিন্তু সম্পদ হবে। দুনিয়ার মানুষ সম্মান চায়, আমিও সম্মানিত হবে, কিন্তু ঐসব জায়গায় একটা শব্দ আল্লাহ তা'আলা লাগিয়ে দিয়েছেন, ঐটা সে ফেলতে পারে না, যে হালালভাবে হব। দুনিয়াদাররা যা দুনিয়া চায়, এ সব আমি ঐগুলোই ওদের মতোই চাই, শুধু একটু ফর্মুলার পার্থক্য, পদ্ধতির পার্থক্য, ওরা হারামভাবে চায়, আমরা দ্বীনদার হালালভাবে চাইব।

কিন্তু যদি দুনিয়াদাররা যা কিছু চায়, ঐটাই চাই, যদিও সে হালালভাবে চায়, যদি শেষ পর্যন্ত মওত পর্যন্ত হালালের উপর থেকেও যায়, সে ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত, দুনিয়াতে। আখিরাতে সে নাজাত পেয়ে যাবে, **কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের যে উপরের দরজা, ঐ দরজা তার জন্য নয়**। যদিও সে গুনাহ যেহেতু করেনি, সে নাজাত পাবে, কিন্তু মুকার্‌রেবিনদের, আল্লাহওয়ালাদের যে দরজা, সেই দরজা সে আর আশা করতে পারবে না। আর দুনিয়াতে সে পেরশানীর মধ্যে থাকবে, কারণ ধন-দৌলত চায়। তারই সাথে যে হারাম-হালাল পরওয়া করেনা, সে অনেকে কিছুই করতে পারছে আর এই হালাল-হারামের কারণে সে অনেক জায়গায় আটকা পরে যাচ্ছে। প্রত্যেকবারই মনে হয় যে আমি তো এগুলোতে বাধা পড়ে গেলাম (কিংবা) এই মুসলমান হওয়ার কারণে, দ্বীনের কারণে এটা করতে পারছি না। এই ব্যাবসা করতে পারিনা, এই ভাবে করতে পারিনা, সুন্দর বড় বাড়ি বানাতে চাই, কেউ একজন এসে আবার বলল যে, এই বাড়ির ব্যাপারেও শরীয়তের কিছু মাসআলা আছে। নিজে

শুনতে চায়নি, কিন্তু অন্যজন এসে বলল, এত উচু করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আরেক অসুবিধা।

যেখানেই সে অগ্রসর হতে চায়, ওখানেই গিয়ে কিছু বাধা পড়ে, প্রত্যেক জায়গায় সে বারবার করে পেরেশান হয়। আল্লাহর মেহেরবানী, নাফরমানী সে করতে রাজি নয়, কিন্তু দ্বীন তাকে প্রত্যেকবার বাধা দিচ্ছে, পেরেশান বাড়ছে। যে দুনিয়ার দৃষ্টিতে দেখে, সে এই বাধাগুলোকে বাধা হিসেবে দেখবে। গায়েবের দৃষ্টিতে যখন দেখবে, তখন সে প্রত্যেক শরীয়তের যত হুকুম আছে, যেগুলো দুনিয়াদার মনে করে যে তাকে শিকল দিয়ে আটকে রেখেছে, হাতে পায়ে বাধা, দৌড়াতে পারছে না অন্যদের মত, আরে সে জন্য বারবার সে প্রতিযোগীতায় পিছনে পড়ে যাচ্ছে, তো ঐ জিনিসকেই আল্লাহওয়ালারা দেখবে যে আল্লাহ তাআলার কত মেহেরবাণী আমি নিজে অনেক জিনিস বুঝতে পারছিলাম না, আল্লাহ তাআলা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন আর আমার পথ চলা অনেক বেশী সহজ হয়ে গেল। ঐগুলোকে সে একটা বিরাট সাহায্য হিসেবে দেখে। কোন একটা সিদ্ধান্ত, আমি কি করব, কি করব না বুঝতে পারছিলাম না, শরীয়ত আমাকে বলে দিল যে এইটা কর।

তো যে জিনিসকে দুনিয়াদার প্রত্যেক জায়গায় একটা বাধা হিসেবে দেখবে, আল্লাহওয়ালা ঐ জিনিসকেই আল্লাহর সাহায্য হিসেবে দেখবে আর তার মনে বড় ভাল লাগবে। তো সাহাবারা রাঃ যখন নামাযের হুকুম পেলেন, বড়ই আনন্দিত হলেন যে আল্লাহর কাছে চাওয়ার, আল্লাহর সাথে সম্পর্ককরার, আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করার একটা সহজ উপায় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়ে দিলেন। বড় খুশীর কথা।

আমরা দেখি আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেই, আমাদের পরিবারের ক্ষেত্রে তো ছেলেকে নামায পড়তে বলি, সে নামায পড়েও, কিন্তু এটা **বোঝা**, তার অনেক বন্ধুরা নামায পড়ে না, তাদের মা বাবা নামায পড়তে বলেও না, ওদেরকে সে ঈর্ষা করে, ওরা কত ভাল আছে। তাকে নামায পড়তে হয় না, আমাকে পড়তে হয়। সে পড়েও, কিন্তু একটা মুসীবত মনে করে। ঐ নামাযই আল্লাহওয়ালারা নিয়ামত মনে করতেন দুনিয়াতেই। ইবনে সীরিন রহঃ এর কথা, 'আমাকে যদি আখিরাতে জান্নাতের মধ্যে জান্নাত ও নামায এর মধ্যে বেছে নিতে বলা হয়, নামাযই বেছে নিব'। নামাযে যে আনন্দ আছে জান্নাতে ঐ আনন্দ আর পাব কোথায়। আর দুনিয়াতেই এটি পাচ্ছেন। ওখানেও পাবে। ফাযায়েলের কিতাবের মধ্যে আছে যে কোন কারণে একটা কবরের ভিতর টাকার থলি নাকি পড়ে গিয়েছিল, আবার যখন খুজতে গেছে ঐটাতে, দেখে যে উনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। (এরকম আছে নাকি? মজমা থেকে কেউ বলল ফাযায়েলে সাদাকাতে) খোজ করে দেখল, মেয়ে বলল যে আব্বা সবসময় এই দোয়া করতে যে কবরে যদি কাউকে নামায পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়, আমি যেন সেটা পাই। খুব ভাল করে জানেন ঐ নামাযে কোন সওয়াব নেই। কোন সওয়াব নেই, ভাল করেই জানেন। তো কেন করছেন? সওয়াব এর জন্য নয়, আনন্দের জন্য। তো দ্বীন তার জন্য, প্রত্যেক হুকুম যার জন্যে আনন্দ নিয়ে আনে। যাকাত দেওয়াও আনন্দময়।

* * *

আমি কারো কাছে শুনেছিলাম, একজন দ্বীনদার লোক ছিলেন, কিন্তু মালের মহব্বত বড় প্রবল ছিল, আর সেই হিসেবে কৃপণও ছিলেন, কিন্তু আবার আল্লাহর হুকুম মানতেনও। উনার ছেলেদেরকে নাকি বলতেন "হিসাব-টিসাব করে যাকাত যা দেওয়ার তোমরা দিও, আমি যদি বাধা দিই, তো আমাকে দরকার হলে রশি দিয়ে বেধে বের করে দিও"। আর তারা করতও তাই। নিজেকে সামলাতে পারতেন না, যে এতটাকা নিয়ে গেল। কিন্তু আবার দ্বীনদারও, সেজন্য নিজের ছেলেদেরকে বলতেন। তো উনাকে বেধে চাবি জবরদস্তি নিয়ে টাকা বের করে দিতে হত। আমলের যে আনন্দ আল্লাহতাআলা দুনিয়ার মধ্যে রেখেছেন, ঐটা থেকে সে বঞ্চিত হবে। (অস্পষ্টঃ মুজাহেদা করলে সওয়াব আছে সেটা ভিন্ন কথা বা এইরকম কিছু কথা)

তো আল্লাহ তাআলা বড় মেহেরবাণী করে আমাদেরকে দ্বীন দিয়েছেন। দ্বীনের উদ্দেশ্য শরীয়তের শুধু আহকামগুলো মেনে নেওয়া নয়। (ব্যাপারটা এমন) যে শরীয়তের আহকাম মেনে নেয়, এর বিরুদ্ধে করছে না, কিন্তু মন মানছে না, সে ঐটার স্বাদ পাবে না। আর জীবন তার কাছে বড় খালি লাগবে, আর নিজের কাছে জীবন এত ভারি লাগছে, ওর কাছ থেকে অন্যান্যরা আকৃষ্ট হবে না। (এরকম) আব্বা বুড়ো হয়েছেন, নামায পড়তে হচ্ছে, আমার কি দরকার। আর কেউ যদি ঐটা খুব আনন্দের সাথে করে, অন্যরা আকৃষ্ট হবে।

* * *

আমি ছোট থাকতে আমার বাবা কি একটা কবিরাজী কিছু ঔষুধ খেতেন। আগে ঔষুধ বানাবার জন্য নৌকার মত কি একটা জিনিস থাকত। ঐটা দিয়ে ঘষে ঘষে মধু দিয়ে কাল রঙের একটা জিনিস। নিয়ম হচ্ছে ঐটা চেটে চেটে খেতে হবে। তো চেটে খেতেন। আমার খুব ইচ্ছা ঐটা আমি খাব। চেয়েছিও, কিন্তু দেননি। তো একদিন ঐটা রেডি করে তারপর একটু বাইরে গেছেন, এই সুযোগে এসে আমি একটু খেয়ে নিয়েছি। সর্বনাশ-তিতা যারে বলে! কিন্তু উনার খাওয়ার ধরন দেখে আমার আগ্রহ হয়েছে। তো আমি যেটা আমল করলাম, আমল এমনভাবে করি যেন মুসীবত। আশেপাশের কেউই ঐ আমলের দিকে আকৃষ্ট হবে না।

আল্লাহওয়ালাদের এক একজন একটা দেশে যেতেন। আর গোটা দেশ তার পিছনে মুসলমান হয়ে যেত। এত আকৃষ্ট হতেন যে, (মানুষ ভাবত) এই লোক যে মজা পাচ্ছে, আমি কেন বঞ্চিত থাকব। এটা বুঝা যায়। কিন্তু আমরা যদি অনেক আমল করলাম, আমলে তো আকৃষ্ট হবে না, আমল করনেওয়ালার ধরন দেখে। আল্লাহতায়ালাও দেখেন যে কেমন করে করছে।

فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُون

“দেখতে চাই তুমি কেমন করে কর” [1]

মনে যদি কারো গভীর আনন্দ থাকে, ও ইচ্ছা করলেও ঐটা গোপন করতে পারে না। ঐটা কোন না কোনভাবে বের হয়েই যায়। আর যদি না থাকে, জবরদস্তি ঐটা বলতেও পারেনা। তো আল্লাহওয়ালারা তাদের দ্বীনের উপর যে চলতেন, ঐ চলার যে আনন্দ ছিল, ঐ আনন্দই মানুষকে ডেকে আনত। ঐ একজনের কারণে লাখো মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। এদেরকে কি বুঝিয়েছে? কিচ্ছু না, বুঝাতে হবেও না। ঐ দেখেই। তো আল্লাহর কাছে চাওয়া যে, আল্লাহ তুমি মেহেরবানী করে আমাকে দ্বীনের উপর চালাও। আর এই দ্বীনের স্বাদ যে আছে ঐটা যেন আমি পাই।

“ ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً

‘ঈমানের স্বাদ ঐ ব্যক্তি আস্বাদন করেছে, যে সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে।’ [2]

যাতা তামাল ঈমান, ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যা’ত বলে জিহ্ববার স্বাদ, মজা, ঈমানের মজা পেয়েছে। কে? রাদিয়া বিল্লাহি রব্বান”। আল্লাহকে রব হিসাবে যে সন্তুষ্ট হয়েছে। আদেশ পালনের কথা বলা হচ্ছে না, (বরং) “রাদি” সন্তুষ্ট (বলা হচ্ছে), বিন ইসলামী দ্বীনা” আর ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সে সন্তুষ্ট, তার মনের ভিতর তৃপ্তি, আল্লাহর শুকর করে। ওয়াবি মুহাম্মাদান সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসুলাও ওয়া নাবীয়্যা” আর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল পেয়ে সে সন্তুষ্ট।

রাসূল পেয়ে সন্তুষ্ট, তার মধ্যে এটাও আছে যে প্রত্যেক সুন্নত তার কাছে বড় আনন্দের। এরকম নয় যে আমল করলাম, কিন্তু এইজন্য করছি যে এটা সুন্নাত, করা উচিত, আর আরেক হল যে এটার উপর আমল করছি, কিন্তু উচিত হিসেবে না, একটা সুযোগ আমি পেয়েছি, বিরাটা একটা সুযোগ। একটা **privilege**।

আর যারা করতে পারছে না বিভিন্নভাবে তাদেরকে বঞ্চিত বলি। (তো যে) নিজে আমল করে, কিন্তু আমলে সন্তুষ্ট নয়, সে আমল না করনেওয়ালার উপর রাগ করে। একজন যাকাত দেয়, কিন্তু যাকাত দেয় (আর) মনে আনন্দ নেই। আরেকজন যাকাত দেয় না, সে ধনী। (তো)গাল দেয় “ঐ বেটা যাকাত দেয় না”। কারণ রাগ ঈর্ষা থেকে আসে, যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি রাগ হয়।

একজন যাকাত দেয় আর এটাকে বহুত বড় নিয়ামত মনে করে। আর আরেকজন যাকাত দেয়না, সে জানে, (তো) যাকাত না দেওয়ার কারণে তার উপর কোন রাগ হয়না, বরং তার প্রতি বড় স্নেহ হয়, মায়া হয়, আহা বেচারা বঞ্চিত। এতবড় নিয়ামত আমি

পাচ্ছি, (আর) ও পাচ্ছে না।

প্রায়ই দেখি অন্যের প্রতি যে রাগ হয়, ঈর্ষা থেকে হয়। একজন হারাম খায়, হারাম খেয়ে বিরাট বাড়ি বানিয়েছে, ছেলেমেয়েরা মহা ধুমধামে আছে, তাদের জামা-কাপড়। আর আমি জানি। আর আমার অত বাড়িও বানাতে পারিনি, আর ছেলেমেয়েদেরকে ভাল জামা কাপড় দিতে পারিনা, ধুমধাম করতেও পারিনা, বিরাট পার্টিও দিতে পারিনা। সে দেয়। ওর দেওয়া দেখে খুব গাল দিই। বদমাইশ, হারামখোর, ঘুষখোর, সুদখোর। কেন বলি? মনে মনে আমিও চাই, কিন্তু পারছি না। কোথাও আটকা পড়ে আছি। সেজন্য ঈর্ষা হয়, তো রাগ হয়। কিন্তু আল্লাহওয়ালা সেক্ষেত্রে কোন গালাগালি দেন না, বরং তার জন্য দোয়া করে, চোখের পানি ফেলে, সুযোগ পেলে দাওয়াত দেয়। কেন রাগ হয় না? ঈর্ষা করে না? বরং তাকে বঞ্চিত মনে করে। আল্লাহ তাআলা আমাকে কতবড় নিয়ামত দিলেন, ও বেচারা তা থেকে বঞ্চিত, ওর জন্য মায়া হয়।

* * *

তো আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে দ্বীন নসীব করুক। মেহনত করা, আল্লাহর কাছে চাওয়া, ‘হে আল্লাহ, তুমি মেহেরবানি করে আমাদের এই গায়েবের পর্দা যেটা আমাদের সামনে আছে, এর হাক্বিকত খুলে দাও, গায়েবের জগতকে যেন দেখতে পাই। আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দাও, যেন জাহেরী জগতের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি, আমাদের চিন্তা, ফিকির যেন আবদ্ধ না থাকে। গায়েবকে যেন দেখতে পাই, এজন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক চাওয়া, দোয়া করা, চেষ্টা করা, আর এইজন্যই দাওয়াত দেওয়া। শুধু তাবলীগে গেলাম, চিল্লা দিলাম, এমন কি শরীয়তের আহকামের উপর চলনেওয়ালাও হয়ে গেলাম, (যদিও) এটাও জরুরী (এমন না)। বরং আমার দৃষ্টি যেন প্রসারিত হয়।

আর দাওয়াতের কথার মধ্যে এটাও আছে

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

এটাই আমার রাস্তা, আল্লাহর দিকে আমি ডাকি, বাছিরাতের সাথে, অন্তর দৃষ্টির সাথে। এই বাছিরাতের সাথে যে ডাকে ওর ডাকের মধ্যে যেন কিছু আছে, দেখতে পাচ্ছে, সে আনন্দের সাথে ডাকে, আগ্রহের সাথে ডাকে। [3]

* * *

আব্দুল ওহহাব সাব লাহোরে ছিলেন, ইসলামিয়া কলেজে সম্ভবত পড়তেন। দ্বীনি জযবা ছিল। কিন্তু তখনকার দ্বীনি যেসব চলতি আন্দোলন-টান্দোলন, ওগুলোর সাথেও একটু জড়িত ছিলেন। আর ঐ দ্বীনের লাইনে কিছু পড়াশুনা ইত্যাদিও করতেন। জান্নাত কি, তার হাক্বীকত কি, তার তাৎপর্য কি। নিজেদের মধ্যে অনেক সময় তাৎপর্য ইত্যাদির আলোচনা হয়, তো সেগুলো। সেই সময় আলোচনার প্রচলিত বই-টই ছিল, সেগুলো কিছু পড়তেন। এটা কি বাস্তব, না এটা কি রূপক, মুসলমান ফিলোসফারদের মতো নানান ধরনের ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐ সময় শুনলেন যে দিল্লীতে মাওলানা ইলিয়াস রহঃ একজন আছেন, দ্বীনের কাজ করা শিখান। তো উনার জযবা ছিল, উনি লাহোর থেকে দিল্লী এলেন দ্বীনের কাজ শিখবার জন্য, ইলিয়াস রহঃ এর কাছে। এজন্য নিজ আন্দাজ মত কিছু ফিস-টিস তো কিছু লাগবে, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি, তো সেই হিসাবে কিছু ফিস-টিসও নিয়ে এলেন, (না জানি) কত দিনের কোর্স ইত্যাদি। (মজমা হেসে ফেলল)

নিজামুদ্দিন মসজিদ গিয়ে পৌছালেন আসরের পরে সম্ভবত। মাওলানা ইলিয়াস রহঃ তখন বয়ান করছিলেন। উনি ঢুকেই শুনলেন। মাওলানা ইলিয়াস রহঃ তখন জান্নাতের কথা বলছিলেন। “জান্নাত , আহ!” এইরকম একটা বললেন। আব্দুল ওহহাব সাব বলেন, “উনার এই “জান্নাত, আহ!” বলে আমার মনে হল ওতো দেখে এসেছে। কোন ফিলোসফির কথা বলছেন না। (বরং) স্বচোক্ষে দেখে এসে বলছেন, কথার ধরন এইরকম। আর ঐ এক কথাতে আমার মাথার ভিতর যত ঘুরপাক, যতসব ফিলোসফি ছিল, সব উড়ে গেল, কারণ এগুলো সরাসরি দেখে এসেছে ও, এরপরে আর কোন ফিলোসফি টিকে। উনি তো

দেখে বলছেন।

তো আল্লাহ তাআলা চান যে দাওয়াত দেওয়া, বাছিরাতের সাথে দেখে যেন দিই, অন্ধের মত না। দাওয়াত দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু না দেখে দিচ্ছি। অথচ আল্লাহতাআলা চান যেন বাছিরাতের সাথে দিই, অন্তরদৃষ্টির সাথে। আল্লাহর কাছে চাওয়া, যত বেশি তাক্বওয়ার উপর চলব, যত বেশি দুনিয়াবি জযবা থেকে, মালের জযবা, ক্ষমতার জযবা, পরিচিতির জযবা, এইসব থেকে নিজেকে যত বেশি সরাব, আল্লাহতাআলা তত বেশি ইনশাআল্লাহ দ্বীনকে বুঝবার তৌফিক নসীব করবেন। আল্লাহ তৌফিক নসীব করুন। আ'মিন।

* * *

سُبْحَانَ اللهِّ وَ بِحَمْدِهِ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّاأَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

[মাজালিসে মুশফিক আহমেদ রহঃ থেকে]

* * *

[1] – সুরা আরাফঃ১২৯

[2] -সহীহ মুসলিম ১/৪৭, হাদীস : ৩৪

[3] সুরা ইউসুফঃ ১০৮